



আবদুল মান্নান

সকলকেই কী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে?

বেসরকারিভাবে বাংলাদেশে প্রায় দু'লাখ বিদেশি কাজ করে এবং প্রতি বছর আমাদের দেশ হতে তারা পাঁচ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাঠায়। এদের বেশির ভাগই কোনো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট না। তাদের কোনো একটি বিশেষ দক্ষতা আছে বলেই তাদের এতো কদর। অথচ তার পাশাপাশি আমাদের দেশের হাজার হাজার গ্রাজুয়েট একটি কাগজের সার্টিফিকেট নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা রাস্তায় কাজের সন্ধানে ঘুরছে। এই পরিস্থিতি হতে উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে কর্মদক্ষতা অর্জন করা যায় এমন বিদ্যা অর্জন করা

১৯৭৩ সালে একবার ইন্ডিয়ান রেলওয়ে আবিষ্কার করলো পাবলিক ফাইনান্স পিএইচডি করা সাতজন গার্ড রেলওয়েতে কর্মরত আছে। তখন কিন্তু ভারত তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ ছিল। বর্তমানে ভারত বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। আমি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েটকে জানি যারা কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের হয় ক্রেডিট কার্ড বিক্রয় করে অথবা কোনো একটি কল সেন্টারে কাজ করে। বেতন দশ থেকে বার হাজার টাকার বেশি নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমও হতে পারে। কোনো কাজকেই ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। কিন্তু এই কাজগুলো করার জন্য চার পাঁচ বছর সময় আর অর্থ ব্যয় করার কী কোনো প্রয়োজন ছিল? অথচ ঢাকা শহরে একজন গাড়ি চালকের বেতন পনের থেকে কুড়ি হাজার টাকা। বাড়ির পানির কল মেরামত করতে আসলে মিস্ট্রিকে কম করে হলেও দু'শত টাকা দিতে হয়। একবার এক কাচবিওয়াল আমাকে দুটি চাবি বন্নিয়ে দিয়েছিল। তাকে পঞ্চাশ টাকা দিলে সে তার হাতের হাতুড়ি দিয়ে আমার মাথায় এক ঘা দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। দেড়শত টাকা দিয়ে রক্ষা পেয়েছিলাম।

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, সমাজবিজ্ঞান, আইনশাস্ত্র, ব্যবসায় প্রশাসন, চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ার যেমন প্রয়োজন আছে ঠিক তেমনই প্রয়োজন আছে কর্মদক্ষতা (Skill) বৃদ্ধি করে এমন বিদ্যা অর্জন করা যা এখন আরো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপে চাকরির শুরুতেই বছরে দেড় লক্ষ ডলার আয় করতে পারে। অন্য কোনো পেশায় চটজলদি এমন অর্থ উপার্জনের সুযোগ তেমন

আর জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সংখ্যা নিয়মিত কমছে। সেই কারণেই তারা বিদেশি শিক্ষার্থী পেতে বেশ আগ্রহী। শিক্ষার্থী না থাকার কারণে বিভাগ বন্ধ হওয়ার অসংখ্য উদাহরণ আছে। বিভাগ বন্ধ হলে শিক্ষক বেকার হবেন। যুক্তরাষ্ট্রে গাড়ি মেরামতের গ্যারেজগুলোর ব্যবসা একচেটিয়াভাবে পাঞ্জাবি শিখদের দখলে। তাদের অধিকাংশই স্কুলের গণ্ডি পার হয়নি। কিন্তু হাতের বিদ্যাটা শিখেছে। বছরে তাদের লাখ ডলার আয়। অন্যদিকে আমাদের দেশ হতে যাওয়া অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েটকে দেখেছি হয় বছরে পঞ্চাশ বা ষাট হাজার ডলারের কোনো একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে অথবা রেইস্ট্রেটে কাজ করে। কেউ কেউ সেলসম্যানের কাজ করছে অথবা কোনো কাজ না পেয়ে অনেকেই ডাষ্টবিন হতে বোতল অথবা প্লাস্টিক কুড়িয়ে তা বিক্রয় করছে। কিন্তু তার যদি হাতের বিদ্যা থাকতো তাহলে তাকে এই কাজ করতে হতো না। যার কোনো একটি বিশেষ ধরনের কাজ করার দক্ষতা আছে, যেমন গাড়ির মেকানিক অথবা রান্নাঘরের বাবুর্চি তাকে তুলনা করা যেতে পারে একটি এটিএম কার্ডের মতো। বিশ্বের কোথাও কখনো তার অর্থ বা কাজের অভাব হবে না। বেসরকারিভাবে বাংলাদেশে প্রায় দু'লাখ বিদেশি কাজ করে এবং প্রতি বছর আমাদের দেশ হতে তারা পাঁচ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাঠায়। এদের বেশির ভাগই কোনো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট না। তাদের কোনো একটি বিশেষ দক্ষতা আছে বলেই তাদের এতো কদর। অথচ তার পাশাপাশি আমাদের দেশের হাজার হাজার গ্রাজুয়েট একটি কাগজের সার্টিফিকেট নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা রাস্তায় কাজের সন্ধানে ঘুরছে। এই পরিস্থিতি হতে উত্তরণের

প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমনা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে দু'টি বিষয় নিয়ে চারিদিকে বেশ তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। প্রথমে এতো জিপিএ-৫, এটা কী মেধার বিস্তারণ? পত্র-পত্রিকায় ছবি ছাপা হয় পরীক্ষায় কৃতকার্যরা দল বেঁধে লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠছে। এর পরপরই শুরু হয় এতো পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হবে কোথায়? সব মিডিয়া নিজের মতো করে হিসেব-নিকেশ করতে বসে। পরে সকলে মিলে চেষ্টা করেন এটা প্রমাণ করতে যে এতো শিক্ষার্থী পাস করলে কী হবে, তাদের বেশির ভাগই তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না। তারপর শুরু হয় সারা দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির জন্য দৌড়ঝাঁপ। মিডিয়া এর নাম দিয়েছে ভর্তিযুদ্ধ। স্বাভাবিক কারণেই অনেকেরই প্রথম পছন্দ পুরানো চারটি বিশ্ববিদ্যালয়—ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর। বিজ্ঞান বিভাগে ভালো করলে চেষ্টা করে মেডিক্যাল অথবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। প্রথম কাতারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গড়ে প্রতি আসনের জন্য চল্লিশ জন পরীক্ষার্থী ভর্তির চেষ্টা করে। অর্থাৎ প্রতি আসনে একজন ভর্তি হলে উনচল্লিশ জন ভর্তি হতে পারে না। তখন মিডিয়া আরেক ধরনের প্রচারণা শুরু করে জিপিএ-৫ পেয়েও অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ে এতোজন ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করলো। যারা এমন চিন্তা করেন তারা বুঝতে পারেন না এখানে পাস ফেলের কোনো ব্যাপার নেই। এটি হচ্ছে বাঁছাই প্রক্রিয়া। কোনো বিভাগে একশত আসন থাকলে এক হাজার ভর্তিচ্ছু সেই সব আসনের জন্য চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে নয়শত জন শেষ গণনায় বাদ পড়বে কারণ তাদের জন্য খালি আসন নেই। তাদের হয়তো সকলেরই যোগ্যতা ছিল। এখানে পাস বা ফেলের কোনো বিষয় ছিল না। যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি সে হয়তো অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকই বাছাই পর্বে টিকে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমনা পরীক্ষায় পাস করে তাদের সকলকেই কী বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে হবে? তার সহজ-সরল উত্তর হচ্ছে না, প্রয়োজন নেই। বাস্তব কারণেই এমন মন্তব্য করতে হচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে মনে করি।



একটা নেই। ফিনল্যান্ডের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বের সেরা বলা হয়। সেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অভিন্ন ও বাধ্যতামূলক। সেখানে সাধারণ বিষয়ের উপর শিক্ষা দেওয়া হয় বটে তবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় কর্মদক্ষতা (Skill Development) শিক্ষার উপর। অষ্টম শ্রেণির পর একজন শিক্ষার্থী ঠিক করবে সে কী ট্রাক ড্রাইভার হবে নাকি ফার্মিচার ডিজাইনার। ফিনল্যান্ডে কোনো স্কুল বোর্ড নেই। কেউ যদি আরো পড়ালেখা করতে চায় তাহলে তাকে 'ও' এবং 'এ' অডেলে পরীক্ষা দিতে হবে, যেমনটি আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা দেয়। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়। যারা সরকারি চাকরি করবেন তারা স্নাতক হলেই চলবে। আর যারা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হবেন তাদের অবশ্যই এমএ ডিগ্রি থাকতে হবে। একজন প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন সেই দেশে একজন আমলার চাইতে অনেক বেশি। কেউ গবেষণা করতে চাইলে সে পিএইচডি পর্যায়ে অধ্যয়ন করতে পারে। বাংলাদেশে এক শ্রেণির সুশীল বুদ্ধিজীবী মনে করেন শিক্ষা একজন নাগরিকের জন্মগত অধিকার। এমনটি অন্য কোনো দেশে মনে করা হয় না। সব দেশই স্বীকার করে প্রাথমিক শিক্ষাই একজন নাগরিকের জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্র এটি সকলের জন্য নিশ্চিত করতে পারলে বুঝতে হবে সে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। পরের শিক্ষা ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। অনেক দেশে সেই স্তরে কিছুটা ভর্তিকি দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ

একমাত্র উপায় হচ্ছে কর্মদক্ষতা অর্জন করা যায় এমন বিদ্যা অর্জন করা।

২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশের এক শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থী দক্ষতা অর্জনের জন্য কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতো। বর্তমানে তা এখন প্রায় ১৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। সরকার দেশে নতুন নতুন বিশেষায়িত কারিগরি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। বেসরকারি খাতেও এই ধরনের একাধিক ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের একটি বড় সুবিধা হচ্ছে তুলনামূলকভাবে কম বয়সী তরুণ প্রজন্ম। এই তরুণদের শুধু সাধারণ বিষয়ে শিক্ষিত করে না তুলে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। আমরা চাই না আমাদের শিক্ষিত তরুণদের পরিণতি ভারতের শিক্ষিত গ্রাজুয়েটদের মতো হোক। চাই না তারা চাকরির পিছনে ছুটুক। চাই চাকরি তাদের পিছনে ছুটবে। চাই তাদের উদ্যোগের কারণে দু'চার দশটা চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সকলকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে এমন চিন্তা মাথা হতে বাদ দিতে হবে। এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য অভিভাবক তো বটেই সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান বিশ্বের অনেক সফল ও ধনী ব্যবসায়ী বা শিল্পপতির কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি নেই।

সম্প্রতি ভারতের উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ পৌরসভা চুক্তিভিত্তিক ১১৯ জন ঝাড়ুদার নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। আবেদন জমা পড়ে ১ কোটি ১০ লাখ। অবাচ্য করার বিষয় হচ্ছে যারা আবেদন করেছে তাদের মধ্যে যেমন আছে চতুর্থ শ্রেণি পাস আর তেমনই আছে প্রকৌশলী, এমবিএ, এমএ, বিএসসি, বিএ পাস করা গ্রাজুয়েটরা। একই দৃশ্য মহারাষ্ট্রে। সেখানে রেলের কুলি পদে নিয়োগের জন্য একটি সাকুলার জারি করা হয়েছিল। দেখা গেল আবেদনকারীদের মধ্যে বেশির ভাগই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট।